হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 11, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, June 2014

"আমি বিগত ছয় মাস ধরে বেশিরভাগ সময়টা অতিবাহিত করছি ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ পড়াশুনা করে। এই পড়াশুনা আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, হিন্দু- মুসলিম ঐক্য সম্ভব তো নয়ই, বাস্তবে অভ্যাসযোগ্যও নয়। মুসলিম নেতাদের ভরসা করতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু কোরান-হাদিসকে কিভাবে? মুসলিম নেতারা কি এই সকল গ্রন্থসমূহের বিরোধিতা করতে পারবে?"

—লালা লাজপত রায়

প্রশাসনের পরিবর্তে বনগাঁ মহকুমা নিয়ন্ত্রণ করছে গরু পাচারকারীরা

পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত সভা-ফেরত হিন্দু সংহতির কর্মীরা

আংড়াইলের গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ মহাশয়

২৪শে মে, ২০১৪, আংড়াইল, বনগাঁ ঃ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ক্রমে বাংলাদেশী চোরাচালানকারী এবং স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ স্থানীয় অসাধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুলিশ-প্রশাসন এবং বিএসএফ-এর একাংশের সঙ্গে পাচারকারীদের অশুভ আঁতাতে ভারত-বাংলাদেশের এই আন্তর্জাতিক সীমানা আজ উন্মুক্ত এবং অরক্ষিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট দ্বারা ৪৫ কেজি সোনা ও অস্ত্রসহ আব্দুল বারিক বিশ্বাসের গ্রেফতার এবং সঙ্গে সঙ্গে জামিনে ছাড়া পাওয়া রাজ্য পুলিশ- প্রশাসনের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের গভীর ঘনিষ্টতারই প্রমাণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জামিন নাকচ হওয়ার পর এই আব্দুল বারিক বিশ্বাস পলাতক। সম্ভবতঃ সে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

গত ১৫ই মে রাতে, বাংলাদেশী গরু পাচারকারীদের হাতে আর.পি.এফ.-এর কনস্টেবল নির্মল ঘোষের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আরও একবার বিদেশী হানাদার তথা এদেশীয় সমাজবিরোধীদের বেপরোয়া কার্যকলাপ সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। নিহত শ্রী ঘোষের বাসস্থান গাইঘাটা থানার আংড়াইল গ্রামে। বাংলাদেশী মুসলমান আড়কাঠিদের অবাধ বিচরণ স্বাভাবিকভাবে বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটালেও, বাস্তবে পুলিশের কাছে বহুবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েও এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সকল প্রচেষ্টাই পরিশেষে নিষ্ফল হয়েছে। উল্টে তাঁদেরকেই বিভিন্নভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

গত ২৪মে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আংড়াইল গ্রামটি পরিদর্শনে যান। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংহতির সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, দেবতনু ভট্টাচার্য প্রমুখ। প্রয়াত শ্রী নির্মল ঘোষের শোকাতুরা মা ও স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন। দৃশ্যতই এলাকার

শেষাংশ ৪ পাতায়

ফরাক্কার অর্জুনপুর শ্মশানঘাটে শবদাহে বাধা

ছিনিয়ে নেওয়া হল শবদেহ

মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার শ্মশানঘাটে শবদাহ করতে এসে দুষ্কৃতিদের বোমা, গুলির সম্মুখীন হতে হল মৃতের পরিবার পরিজনদের। প্রাণ বাঁচাতে হাজারপুর গ্রামের বীরেন পালের অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ ফেলে পালাতে বাধ্য হলেন তাঁর পরিবারের লোকেরা।

সূত্রের খবর, গত ৪ মে, সন্ধ্যা নাগাদ মৃত বীরেন পালের শব দাহ করার জন্য মৃতের পরিবার পরিজনেরা অর্জুনপুরের প্রাচীন শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়। মুখাগ্নি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে শ্মশান সংলগ্ন বস্তি থেকে ভোদু শেখ, রফিকুল শেখ, আমিন শেখ, হাবিল শেখদের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিদের একটি দল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ শ্মশানবন্ধুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুষ্কৃতিদের বোমা ও গুলির আঘাতে আহত কেষ্ট পাল, বিকাশ পাল সহ বাকি সকলে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে শ্মশান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পরে যখন তারা ফিরে আসে তখন বীরেন পালের অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ, অস্থি, ভস্ম—কিছুই সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃতের শোকস্তব্ধ পত্নী রাখী পাল ফরাক্কা থানায় ঘটনার বিবরণ দিয়ে, দুষ্কৃতিদের নাম সহ এফ আই আর করেছেন। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায় নি।

এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ৬ মে। অন্য একটি শবদাহকে কেন্দ্র করে ওই একই শ্মশানঘাটে

শেষাংশ ২ পাতায়

বাংলাদেশী গো-পাচারকারীদের হামলায় নিহত আর.পি.এফ. জওয়ান

গত ১৫ই মে এক নির্মম ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটা থানার সীমান্তঘেঁষা আংড়াইল-ঘোষপাড়া। বাংলাদেশী গো-পাচারকারীদের হামলায় নিহত হলেন আর.পি.এফ. জওয়ান নির্মল ঘোষ (৪০)। দুষ্কৃতিদের আক্রমণে মারাত্মক জখম তাঁর দাদা পরাণ ঘোষ বর্তমানে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঠিক কি ঘটেছিল সেদিন? স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, ইছামতী নদী পেরিয়ে প্রায় শ'দুয়েকেরও বেশি বাংলাদেশী দুষ্কৃতি এপারে এসে ধারাল অস্ত্র দিয়ে নির্মমভাবে কুপিয়ে খুন করে আর পি এফ-এর শিয়ালদহ শাখার কনস্টেবল নির্মল ঘোষকে। তাঁর দাদা পরাণ ঘোষ ও তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁকেও ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে দুষ্কৃতিরা। তাঁর মাথায় চারটি সেলাই পড়েছে। পরিবারের মহিলাদেরও অশালীনভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। বনগাঁর এস.ডি.পি.ও. মীর শাহিদুল আলির রুটিন বয়ান, ''দুষ্কৃতিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।''

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে ইছামতী পেরিয়ে ওপারের পুটখালি থেকে এপারের আংড়াইলে পাচারের উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিরা। গ্রামবাসীদের বাড়ির উপর দিয়েই যাতায়াত করে তারা। প্রতিবাদ করা অসম্ভব। ১৪ই মে বুধবার রাতে ওই গ্রামের বাসিন্দা নির্মলবাবুর বাড়ির উপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে তারা তাঁর মোবাইল ফোন চুরি করে। এদিন হাসপাতালে পরাণ ঘোষ পুলিশকে জানান, তিনি এলাকার কিছু বাংলাদেশী পাচারকারীকে চেনেন। ফোন চুরি হওয়ার পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালে তিনি তাদের কাছে চুরি যাওয়া ফোনটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তারা তাঁকে জানায়, বাংলাদেশের ওই দুষ্কৃতিদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বুধবারই রাত দশটা নাগাদ পরাণবাবুর বাড়ির সামনে লাঠি নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয় দু'জন। পরাণবাবুর চিৎকারে আশপাশের কয়েকজন ছুটে আসেন। একজনকে ধরে ফেলে সবাই, অন্য জন পালায়। ধৃত ব্যক্তির ফোন থেকে ফের বাংলাদেশী পাচারকারীদের ফোন করে সিমকার্ড ফেরত দিতে বলেন পরাণবাবু। তাঁরা তাকে জানায়, তারা সিম ফেরত দিতে যাচ্ছে। পাশাপাশি তাঁকে এ-ও জিজ্ঞাসা করে, যাকে ধরে রাখা হয়েছে, সে কোথায়? পরাণবাবুর দাবি, অন্য যে দুষ্কৃতি পালিয়েছিল, সে-ই বাংলাদেশে গিয়ে পাচারকারীদের খবর দিয়েছিল। এর পরে রাত ১১টা নাগাদ ইছামতী পেরিয়ে ওপার বাংলা থেকে প্রায় শ'দুয়েকেরও বেশি সশস্ত্র মুসলমান দুষ্কৃতি এপারে আসে। ততক্ষণে নির্মলবাবুও ঘটনাস্থলে চলে এসেছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে দুষ্কৃতিরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরাণবাবুর মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে ও লাঠি দিয়ে তাঁকে মারতে থাকে তারা। তিনি কোওরকমে পালান। নির্মলবাবুকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় আংড়াইল বিএসএফ ক্যাম্পে। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই পালায় দুষ্কৃতিরা। নির্মলবাবুকে খুঁজতে শুরু করেন তাঁর দাদা ও এলাকার বাসিন্দারা। একটি গর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। এলাকার মানুষ দু'জনকেই বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা নির্মলবাবুকে মৃত ঘোষণা করে বলেন, মাথায় ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে। রাতেই গাইঘাটা থানার ওসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় এলাকায় তদন্ত করতে যান। নির্মলবাবুর স্ত্রী, আট বছরের মেয়ে ও পাঁচ মাসের ছেলে আছে। পরিবারটি এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাঁদের দাবি, এলাকারই কেউ নির্মলবাবুকে চিনিয়ে দিয়েছিল দুষ্কৃতিদের। খুনীদের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা স্থানীয় রামনগর রোড অবরোধ করেন বাসিন্দারা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে অবরোধ ওঠে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা নদী পেরিয়ে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিরা চলে আসে এপারে। অতীতে বিএসএফ-এর সঙ্গে পাচারকারীদের সংঘাত হয়েছে। মেয়েদের উপরেও অত্যাচার করেছে তারা। বাসিন্দাদের দাবি, গুলি চালানো নিয়ে বিএসএফ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরেই দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ২১ মে স্থানীয় পুলিশ ও বি এস এফ-কে নিয়ে একটা সভা ডেকেছিলেন বাসিন্দারা। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ধ্যানেশ নারায়ণ গুহ বলেন, ''ওই এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতার না দেওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।''

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্ত এলাকাগুলিতে গরু-পাচার এক সংঘটিত অপরাধমূলক শিল্পে (Organized Crime Industry) পরিণত হয়েছে। বিগত কয়েক দশকের এই অপরাধ বর্তমানে এক মহীরূহে পরিণত হয়েছে। ''রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ'' হবার এই কর্মযজ্ঞের প্রধান পুরোধা হল সীমান্ত লাগোয়া মুসলমান জনগোষ্ঠী। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে স্থানীয় কিছু কর্মহীন ডাকাবুকো বেকার হিন্দু এজেন্ট। পাশাপাশি বিএসএফ-এর গুলি চালাবার অধিকার হরণ করে, তাদের নপুংসক শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে চলে কাঁচাটাকার (কমিশনের) হরির লুঠ। কে নেই সেখানে—প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাব্যক্তি থেকে

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস ঃ কিছু প্রশ্ন

ষোড়শ লোকসভা ভোটের ফলাফল বেরিয়ে গেল। কেন্দ্রে বিজেপি ও তার সহযোগী এনডিএ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অধিকার করেছে। এনডিএ-এর এই বিশাল সাফল্যের কোন ছাপ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পড়েনি। বিক্ষিপ্ত ভাবে দুটো আসন দখল করলেও এবং ভোটের শতাংশ বাড়িয়ে নিলেও পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল তৃণমূলের জয়জয়কার। ৪২টির মধ্যে ৩৪টি আসন দখল করেছে শাসকদল। কিন্তু কেন্দ্রে এনডিএ-সরকার বা রাজ্যে তৃণমূলের জয়জয়কার কোনটাই হিন্দু সংহতির আনন্দ বা মাথাব্যথার কারণ নয়। তবে ভোট ও তার ফলাফল জানার পরবর্তী যে সন্ত্রাস রাজ্য জুড়ে চলছে, তা কিন্তু ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণতন্ত্রে সার্বজনীন ভোট যে একটা বড় বালাই এ কথা সকলেরই জানা। ভোটে জয়লাভ করলে শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করা যায়, তা রাজনৈতিক দলগুলো ভালোভাবে জানে। তাই ভোট বা ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস নতুন কোন ঘটনা নয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে সন্ত্রাস চালায়। কিন্তু এবারের পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা একটু অন্যরকম। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের বিপুল জয়ের পিছনে সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাঙ্ক কাজ করেছে। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরাও তাই মনে করেন। আর সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যালঘু দুষ্কৃতিরা গ্রামেগঞ্জে সাধারণ হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের দলীয় পতাকা সামনে রেখে তারা এই সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক মোড়ক দিতে চাইছে। দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার সীমান্তবর্তী অঞ্চল, উস্তি, ফলতা, মগরাহাট, উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে ক্রমাগত সংখ্যালঘুদের দ্বারা নিরীহ হিন্দু গ্রামবাসীরা আক্রান্ত হচ্ছে। শাসকদলের পতাকার তলায় এই সন্ত্রাস চলছে বলে প্রশাসনও ভয়ে দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না। সাজাহান সেখ, সেলিম, শওকত মোল্লা বা আব্দুল বারিকরা এখন তৃণমূলের ছত্রছায়ায় আছে বটে, কিন্তু তারা সবাই বাম আমলে সি.পি.এম.-এরই ছত্রছায়ায় ছিল, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দুষ্কৃতিরা সবাই দ্রুত রঙ পাল্টে তৃণমূল হয়ে গিয়েছে। সেদিনও লালঝাণ্ডা ধরে এরা হিন্দুর উপর অত্যাচার করেছে, আজও এরা জোড়াফুলের ঝাণ্ডা ধরে সেই একই কাজ করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলের হিন্দুর কোন পরিত্রাণ নেই। এই বাস্তব সত্য আজ সকলের বুঝে নেওয়ার সময় এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকেও বুঝতে হবে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটেই তারা এই বিপুল জয় পায়নি। হিন্দুরাও তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও আস্থা রেখেছে। তাই একতরফাভাবে গ্রামেগঞ্জে হিন্দুরা যেভাবে মার খাচ্ছে ইসলামিক গুণ্ডাদের কাছে, প্রতিবাদ করলে পুলিশি নির্যাতন হচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। গত কয়েকদিনে, হাড়োয়া, সন্দেশখালি, উস্তি, মগরাহাট, বনগাঁ-য় ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতিরা। ঐ সব অঞ্চলের সাধারণ হিন্দু আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। সরকার ও প্রশাসন অবিলম্বে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বাংলার প্রতি ভালোবাসা যে অকৃত্রিম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অবিমৃষ্যকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের মান-সম্মান, সম্পত্তি আজ বিপন্ন। তাঁর সাধের মা-বোন আজ ধর্ষিতা, মাটি ক্রমশ চলে যাচ্ছে বিদেশী শক্তির দখলে আর মানুষ হয়ে পড়ছে পরাধীন। এ অবস্থা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে টেনে তোলার দায়িত্ব আপনার। আপনার সে ক্ষমতা আছে। শুধু সদিচ্ছাটা প্রয়োগ করুন। এ অনুরোধ আমরা আপনার প্রতি রাখলাম।

১ম পাতার শেষাংশ

নিহত আর.পি.এফ. জওয়ান

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সব্বাই এখানে সামিল। ফলতঃ এলাকাগুলি পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের মুসলমান দুষ্কৃতিদের মুক্ত অভয়ারণ্যে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সীমাহীন নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ, তাতে প্রতিনিয়ত ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছে। ফলে আইনরক্ষকদের দ্বারা সুরক্ষিত এই দুষ্কৃতিদের হাতে এখন কোটি কোটি টাকার পাহাড়। বিপদে পড়েছেন এলাকার শান্তিপ্রিয় সাধারণ খেটে খাওয়া হিন্দু মানুষ। স্থানীয় হিন্দু মহিলাদেরও ইজ্জত-আব্রু নিয়ে প্রায়শই চলছে টানাটানি। এই নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলেও, ইছামতী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, কিন্তু দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবের ভয়ে এবং সেই ভাবে জনচেতনা সংঘটিত না হওয়ায় বাস্তব পরিস্থিতির কিছুমাত্র পরিবর্তন (উন্নতি) সাধিত হয়নি। চোখে লঙ্কা ডলে, কপারসালফেট খাইয়ে, বড় বস্তা সেলাইয়ের ছুঁচ ফুটিয়ে যেভাবে সর্বসাধারণের সামনে দিয়ে দিবালোকে নিত্যদিন গোধন পাচার চলে, তা দেখে অনেকেই চোখের জল সামলাতে পারেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে মরমে মরা ছাড়া আর গতি কী? তার উপর দুষ্কৃতকারীরা সহজেই ওপার বাংলায় পালিয়ে যেতে পারে বলে তাদের ধরা পড়ারও কোন ভয় থাকে না। তাইতো এই দস্যুরা এখানে স্থানীয় নিরীহ হিন্দুদের প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে এলাকা ছাড়া করার ভয় দেখায়। জনসমক্ষে বলে,— ''টাকা রাখবি ব্যাঙ্কে, গরু রাখবি ক্যাম্পে, বউ-মেয়ে রাখবি কোথায়?'' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে প্রতি রাতের হানাদারদের হাত থেকে গরুগুলিকে রক্ষা করার জন্য অনেকেই তাদের এই প্রিয় পোষ্যদের প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে বেঁধে রেখে আসতে বাধ্য হন। গ্রামের মানুষ, যাদের অনেকেরই ঘরে কোন ইলেকট্রিক ফ্যান না থাকা সত্ত্বেও বাইরে খোলা হাওয়ায় শোবার কোন জো নেই। এই গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের সময়েও রাতে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে অসহ্য গরমে অনিদ্রায় ছটফট করতে হয়। সবচেয়ে করুণ অবস্থা স্থানীয় হিন্দু রমণীদের। শতকরা ১০০ ভাগ নিরাপত্তাহীনতা তাদের নিত্যসঙ্গী। দেশ এবং দেশবাসীর নিরাপত্তা তথা সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আপোষ করে সরকারের প্রকাশ্য মদতে পরিপুষ্ট ভয়ানক এই পাচারকার্য, আধুনিক পৃথিবীর মানচিত্রে এক বিরলতম ঘটনা।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, বিজেপির এক শক্তিশালী সরকার নির্বাচিত হওয়ায় এলাকার বহু মানুষ ইতিমধ্যে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন। দেখা যাক দিল্লীর ঐ বদলে, এখানকার কোন পরিস্থিতি বদলায় কিনা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ স্বরূপ গত ২৪শে মে, শনিবার বিকাল ৩টায় হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এলাকা পরিদর্শন করেন। তৎসহ ওইদিনেই আংড়াইল-ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রতিবাদ সভা। হিন্দু সংহতির স্থানীয় প্রতিনিধি শ্রী অজিত অধিকারী ইতিপূর্বেই ক্ষতিগ্রস্থ ও সন্ত্রস্ত পরিবারটির সঙ্গে দেখা করে, শোক-সন্তপ্তদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং অদূর ভবিষ্যতে যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকার সর্বাঙ্গীন অঙ্গীকার করেন।

রামপুরহাট থেকে প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার

বেআইনি ভাবে মজুত করে রাখা প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার হল রামপুরহাট থানার বারমেশিয়া এলাকার একটি পাথরভাঙা কারখানার গুদামঘর থেকে। ১৩ মে রাতে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কোটেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে এই বিস্ফোরকগুলি উদ্ধার করে। বুধবার জেলা পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান বলেন, ''গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গুদামে হানা দিয়ে ৪১ কার্টুন জিলেটিন স্টিক (প্রতিটি কার্টুনের ওজন প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ কেজি) ও ২১ বাণ্ডিল ডিটোনেটর (প্রতিটি বাণ্ডিলে ২৫টি করে ডিটোনেটর আছে) উদ্ধার করা হয়।''

গত ৪ মার্চ রামপুরহাট থানার সেনবাঁধা গ্রাম থেকে ২০ প্যাকেট জিলেটিন স্টিক এবং ২৫ বাণ্ডিল ডিটোনেটর উদ্ধার হয়েছিল। ওই ঘটনায় পুলিশ ওই রাতেই সেনবাঁধা গ্রামের তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে। কেউ অবশ্য জামিন পায়নি এবং সিআইডি-র হাতে ঘটনার তদন্তভার রয়েছে। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি মুরারই থানা এলাকা থেকে দুজনকে অবৈধভাবে বিস্ফোরক মজুত রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। জিলেটিন স্টিক, ডিটোনেটরের পাশাপাশি ২৫ কুইন্টাল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হয়েছিল। রামপুরহাট, নলহাটি, মুরারই থানাগুলি মাওবাদী এলাকা বলে ঘোষিত। বুধবার রামপুরহাটে এসে এসপি বলেন, ''এই ঘটনার সঙ্গে মাওবাদী যোগ আছে কি না তদন্ত করে দেখার পর বোঝা যাবে। তবে যে ভাবে ওই বিস্ফোরকগুলি আনা হয়েছিল এবং যে জায়গায় রাখা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অবৈধ।''

এ দিকে পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, একাধিকবার অবৈধভাবে মজুত বিস্ফোরক উদ্ধার কিন্তু ঝাড়খন্ড সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার এলাকা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলবার রামপুরহাট থানার যে জায়গা থেকে ওই বিস্ফোরক উদ্ধার হয়, সেই বারমেসিয়া থেকে ঝাড়খন্ডের শিকারিপাড়া থানার একটি গ্রামের দূরত্ব পাঁচ কিমি এবং শিকারিপাড়ার দূরত্ব ৩০ কিমি। লোকসভা নির্বাচনের সময় ঝাড়খন্ডের শিকারিপাড়া থানা এলাকার যে জায়গায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটেছিল,

সেই জায়গার দূরত্বও রামপুরহাট থানা থেকে প্রায় ৪০ কিমি। তা হলে পুলিশের নজরদারী এড়িয়ে কি ভাবে বিস্ফোরক মজুত করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এসপি রশিদ মুনির বলেন, ''প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যে বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে সেগুলি ওড়িশার রাউরকেল্লা থেকে আনা হয়েছে। কোন পথে কোন গাড়িতে করে এসেছে তদন্ত করে দেখতে হবে। তবে আমাদের নজরদারি ছিল বলেই তো বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে।''

তবে বিস্ফোরকগুলি মূলত পাথর খাদানে বিস্ফোরণ করানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। রামপুরহাটের বারমেসিয়া, তেঁতুলবাঁধি, বড়পাহাড়ি, দীঘলপাহাড়ি এলাকায় পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকায় একমাত্র বড়পাহাড়ি এলাকায় পাথর খাদান আছে। বারমেসিয়া, তেঁতুলবাঁধি, বড়পাহাড়ি, দীঘলপাহাড়ি এলাকায় অধিকাংশ পাথরভাঙা কারখানায় পাথরের জোগান ঝাড়খন্ডের শিকারিপাড়া থানার চিত্রাগড়িয়া, সারাসডাঙা এলাকার খাদান থেকে আসে। বড়পাহাড়ি পাথর ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সম্পাদক সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''আমাদের এলাকায় কুড়িটি পাথর খাদানের মধ্যে ৮-১০টি বর্তমানে চালু আছে। ওই সমস্ত খাদানে সরকার অনুমোদিত মল্লারপুরের একটি সংস্থার সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে ওই সংস্থার লোক এসে কখনও খাদানে তাদের বিস্ফোরক রাখার মজুত ঘর (ম্যাগাজিন) থেকে বিস্ফোরক নিয়ে খাদানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। আবার সংস্থার মোবাইল ভ্যান এসে খাদানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়।'' পুলিশের দাবি, যে পাথরভাঙা কারখানার গুদামঘর থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়, সেই কারখানায় বিস্ফোরক থাকার কথা নয়। কী কারণে ওই পাথরভাঙা কারখানার মালিক বিস্ফোরক রেখেছিল তার সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। ওই কারখানার মালিক জহিরুল শেখেরও খোঁজ চলছে।

সরকারী জমি জবরদখলের অপচেষ্টা ব্যর্থ করল হিন্দু সংহতি

দঃ ২৪ পরগনার জয়নগরের শশাপাড়া খালের ধার এলাকাটি বরাবর হিন্দু অধ্যুষিত। এই অঞ্চল থেকে হিন্দুদেরকে উচ্ছেদ করে দিয়ে পাশের গ্রামের কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি খালের পাশের জমি দখল করার চেষ্টা করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে।

গত ২৬ মে সকালে খালের পাশে একটি জায়গায় ইমারতি দ্রব্য মজুত করে সেখানে একটি বে-আইনি নির্মাণ করতে উদ্যোগী হয় পাশের গ্রামের দুষ্কৃতি মুন্না শেখের নেতৃত্বে বেশ কিছু মুসলিম যুবক। এই উদ্যোগ যে বে-আইনি নির্মাণ করে হিন্দু এলাকা দখল করার ষড়যন্ত্র, তা বুঝতে পেরে শশাপাড়ার হিন্দু যুবকেরা হিন্দু সংহতির উদ্যোগে সমবেতভাবে ঐ বে-আইনি নির্মাণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দখলকারী মুসলিমরা কোনও কথা না শুনে জোর করে নির্মাণকার্য চালিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তারা এও বলতে থাকে প্রশাসন আমাদের কিছু করতে পারবে না। তখন হিন্দু যুবকদের সাথে মুসলিম দুষ্কৃতিদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই জয়নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশ এসে ওই নির্মাণ কার্য বন্ধ করে দেয়। প্রশাসনের পক্ষে আরও বলা হয় এখানে নতুন করে কোনো নির্মাণকার্য করা যাবে না।

স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা অবশ্য পুলিশের আশ্বাসে আশ্বস্ত নয়, তাঁরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন বলে সংহতির কর্মকর্তা রাজকুমার সরদার আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

১ম পাতার শেষাংশ

ফরাক্কার অর্জুনপুর শ্মশানঘাটে শবদাহে বাধা

সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে দুষ্কৃতিরা শ্মশানঘাটে তাণ্ডবের পরে ফরাক্কা রেল স্টেশন সংলগ্ন ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আক্রমণ করে যথেচ্ছভাবে ভাঙচুর ও লুঠপাট করে। এর পরে অর্জুনপুরে বাজারে ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক গুণধর ঘোষের দ্বিতীয় দোকান একইভাবে আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাক্কা থানায় এফ আই আর করেছেন গুণধরবাবু। উপর্যুপরি এই দুটি ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুরা আতঙ্কিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক স্থানীয় বাসিন্দার কথায় মুর্শিদাবাদ জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ক্রমাগত এই ধরণের আক্রমণ ঘটে চলেছে। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। এই অর্জুনপুর শ্মশানঘাটের পাশে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশী মুসলমানদের যে বস্তি গড়ে উঠেছে, তারাই এই শ্মশানঘাটের জমি দখল করতে চাইছে। হিন্দুদের উপর এই অন্যায় সত্ত্বেও সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের মহিমায় সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার। এই পরিস্থিতিতে এলাকার হিন্দুদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই।

মোদীর এই বিপুল জয়ের পিছনে আসল কারণটা চেপে যাওয়ার কুচেষ্টা করা হচ্ছে

প্রথম পর্ব

তপন কুমার ঘোষ

এই স্তম্ভে আমি সাধারণতঃ রাজনীতির বিষয়ে লিখি না। কিন্তু এবার সদ্য সমাপ্ত ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন সম্বন্ধে লিখব। এই নির্বাচনের ফলের তাৎপর্য শুধু রাজনৈতিক বলে আমি মনে করি না। তার থেকেও বৃহত্তর ও গভীরতর তাৎপর্য আছে বলেই আমি মনে করি। তাই আজকের এই কলমে নির্বাচন নিয়ে লেখা।

ভারতের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পর দেখা গেল যে বহু বিষয়ই এবার প্রথম ঘটল। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম একটি অকংগ্রেসী দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। এই প্রথম অনেকগুলি বড় বড় রাজ্য থেকে কংগ্রেস মুছে গেল। এই প্রথম কংগ্রেস কোন রাজ্যেই দুই অঙ্কে অর্থাৎ নয়-এর বেশি আসন পেল না। এই প্রথম কংগ্রেসের আসন একশ'র নিচে, এমনকি পঞ্চাশেরও নিচে নেমে গেল, যা অকল্পনীয়। এই প্রথম মুসলিম এম.পি.-র সংখ্যা সবথেকে কম হল। এই প্রথম হাওয়া বুঝতে পেরে চিদাম্বরম, মনীশ তেওয়ারির মত নামকরা কংগ্রেসী নেতারা নির্বাচনের আগেই সরে পড়েছিলেন। এই প্রথম অনেকটা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ধাঁচে ভারতে নির্বাচন হল। এই প্রথম কোন একজন নেতা সবথেকে দীর্ঘ নির্বাচনী সফর ও প্রচার সভা করলেন। এই প্রথম কয়েকজন ধর্মগুরু অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তাঁদের শিষ্যদের নির্বাচনের কাজে লাগালেন।

আমার থেকেও পণ্ডিত ব্যক্তিরা আরও অনেক 'এই প্রথম' খুঁজে বের করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারবেন। কিন্তু যে 'এই প্রথম' টাকে অনেক বোদ্ধা-বিশ্লেষক-সমালোচকই লুকিয়ে রাখতে চাইছেন বা চেপে রাখতে চাইছেন, সেটাকে তুলে ধরার জন্যই এই লেখা।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সিংহপুরুষ মুসলিম ভোটের পরোয়া না করে শুধু হিন্দু ভোটকে সংহত করে তাঁর দলকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিলেন। এটাকেই ধ্রুবীকরণ (Polarisation), বিভেদের রাজনীতি ইত্যাদি বলা হয়েছিল। ঐ সিংহপুরুষ সেসব সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে স্থির লক্ষ্যে অবিচলভাবে এগিয়ে গিয়েছেন। তার ফল ফলেছে। ভারতের হিন্দু জম্মু থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, কচ্ছ থেকে অরুণাচল, ধনী থেকে নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ থেকে দলিত—সকলে একসঙ্গে দু'হাত ভরে ঢেলে ভোট দিয়েছে সেই অনমনীয় দৃঢ়তাকে। এর থেকে বড় জাতীয় সংহতি আর কী হতে পারে?

অনেকে বলবেন—মুসলমানরা তো ভোট দেয়নি। তাই এই ২০ কোটি মুসলমানকে বাদ দিয়ে কি জাতীয় সংহতি হতে পারে? হ্যাঁ হতে পারে। ভারতের জাতীয় সংহতিতে মুসলমানদের কোন ভূমিকাই থাকার কথা নয়। যারা ভারত বহির্ভূত একটি স্থানের (মক্কা) দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে, যারা নিজ সন্তানের নামকরণে ভারতীয় শব্দ ও নাম খুঁজে পায় না, যারা ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে না, যারা এদেশকে 'নাপাক' (অপবিত্র) বলে এদেশকে বার বার খণ্ড-বিখণ্ড করেছে, যারা এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাকে (সংস্কৃত) গ্রহণ করেনি, যারা এদেশের উপর বিদেশী আক্রমণকারীকে বেশি আপন বলে মনে করে, এদেশের জাতীয় সংহতিতে তাদের কোন ভূমিকা থাকার কথা নয়। থাকার কথা নয়, কিন্তু তবু আছে। কারণ সংহতির ঠিক বিপরীত শব্দটাই হল বিঘটন বা বিভাজন। টাকার দু'পিঠ একসঙ্গে থাকলেও এই দুটি শব্দ একসঙ্গে থাকতে পারে না। সংহতি থাকলে বিভাজন হবে না, বিভাজন হলে সংহতি থাকবে না। ভারতের জাতীয় সংহতিতে মুসলমানদের কোন ভূমিকা না থাকলেও ভারতের বিভাজনে তাদের ভূমিকা আছে—এটা ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। তাই সংহতিতে নয়, কিন্তু বিভাজনে অর্থাৎ সংহতি ভাঙ্গাতে তাদের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অর্থাৎ ভারতের জাতীয় সংহতিতে মুসলমানদের একটা বড় ভূমিকা আছে—তা হল নঞর্থক (Negative) ভূমিকা।

ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত এই Negative ভূমিকাকে মনে রাখলে একথা স্বীকার করাই ভালো যে বর্তমানে মুসলমানদেরকে হিসাবের বাইরে রেখে জাতীয় সংহতি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তাহলে মুসলিম ভোটবিহীন মোদীর এই বিপুল জয় ভারতের জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করবে কি না—এই প্রশ্নটা ন্যায্য। মুসলমানরা কোনবারই বিজেপি-কে ভোট দেয় না। এবারও দেয় নি, এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু মুসলিমরা তো বরাবরই কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে এসেছে। তাতে কি আমাদের জাতীয় সংহতি মজবুত হয়েছে? তাহলে কাশ্মীর আজ প্রায় বিচ্ছিন্ন কেন? অন্য সব রাজ্যেও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে মুসলমানরাই একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন কেন? ভারতের জাতীয় সংহতি ২০ কোটি মুসলমানকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। তাদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ চাই। কিন্তু সেটা পাওয়া যাবে কিভাবে? এইভাবেই পাওয়া যাবে। তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তাদের সমর্থন ছাড়াই দেশ চলতে পারে, দল চলতে পারে, সরকার চলতে পারে। তবেই তারা সমর্থন দিতে এগিয়ে আসবে। না হলে নয়। এতদিন তাদেরকে এর ঠিক উল্টোটাই বোঝানো হয়েছে। তাদের সমর্থন ছাড়া সরকার গঠন অসম্ভব, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো একেবারেই অসম্ভব। তাই ভোটে তাদের সমর্থন পেতে যা যা করা হয়েছে তা সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধিকে হার মানায়, এমনকি জোকাররাও লজ্জা পায়। ব্রাহ্মণকন্যা মমতা ব্যানার্জীর হিজাব পরিহিত ছবি আমাদের ছোট ছোট শিশুদের মনকেও বিভ্রান্ত করে তুলছে। সবদলের সব নেতাদের মাথাতেই জাল টুপির ছবি, রোজা না করে ইফতার খাওয়া, বিখ্যাত রিফিউজি কমিউনিস্ট নেতার বুক ঠুকে হিন্দু এলাকায় পরিত্যক্ত মসজিদে দূর থেকে মুসলমান নিয়ে এসে নামাজ পড়ানো, বাংলাদেশী মুসলমানকে নিয়ে এসে সরকারী জমিতে বসিয়ে ভোটার বাড়ানো। আর চূড়ান্ত হয়েছিল গত নির্বাচনেই (২০০৯), বিখ্যাত দলিত নেতা রামবিলাস পাসোয়ান নির্বাচনী সভাগুলিতে তাঁর সঙ্গে লাদেন সদৃশ একজনকে নিয়ে গিয়ে মঞ্চে নিজের পাশে বসিয়ে রাখা। এসব থেকে মুসলমানদের এ ধারণা হওয়া তো খুব স্বাভাবিকই ছিল যে, তাদেরকে ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলি চলে না, তাদের ভোট ছাড়া কোন দল জিততে পারে না। তাই তাদের এত খাতির, এত দর। আর এসব দেখে শুধু মুসলমানদের নয়, হিন্দুদের মনেও এরকম একটা ধারণা জোরালোভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমান ভোট ছাড়া কোন দলের পক্ষেই ভালোভাবে জেতা অসম্ভব।

এই দৃঢ় প্রোথিত ধারণাকেই ভেঙে চুরমার করে দিল এবারের নির্বাচনের ফল। মুসলিম ভোট না পেয়েও মোদী একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ শুধু হিন্দুর ভোটেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানদের ছাড়াই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবার তারা হাড়ে হাড়ে বুঝলো যে, হিন্দুরা কিছুটা এক হলেই তাদের আর দরকার নেই। এরপর হিন্দুরা যদি আর একটু বেশি পরিমাণে এক হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানদেরকে কোন রাজনৈতিক দলের আর একেবারেই দরকার নেই। এই বোধই তাদেরকে হিন্দুর আরও কাছে নিয়ে আসবে। ফলে জাতীয় সংহতি আরও দৃঢ় হবে। অর্থাৎ মুসলমানকে তেল দিয়ে কাছে টানার চেষ্টা করে নয়, হিন্দুকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করলেই জাতীয় সংহতি আরও দৃঢ় হবে এবং তাতে মুসলমানদেরও ভূমিকা থাকবে। তবে সেই ভূমিকা এবার নঞর্থক নয়, সদর্থক হবে। তারা নিজেরাই এগিয়ে আসবে।

সুতরাং এই নির্বাচনে মুসলিম ব্লকভোটের 'মিথ্' (অপরিহার্যতা) টা ভেঙে গেল। শুধু তাই নয়, জাতীয় সংহতির দিকেও দেশ আর এক পা এগিয়ে গেল। মুসলিম ভোটের এই মিথ্ ভেঙে যাওয়া এবং মাত্র কিছুটা পরিমাণে সংহত হিন্দু ভোটের এই সাফল্যকে চেপে দিয়ে হিন্দুকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা সেক্যুলার নামধারী ইসলামের এজেন্টরা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টাকে বানচাল করে দিয়ে হিন্দুকে তার সাফল্যটা দেখিয়ে তাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলাটাই আজ ঐতিহাসিক প্রয়োজন। সেটাই আমাদের জাতীয় সংহতিকে আরও দৃঢ় করবে।

আর একটু গভীর বিশ্লেষণে যাওয়ার চেষ্টা করি। হিন্দু ভোট ও হিন্দুত্ব ভোট। দু'টো এক নয়। এবার নির্বাচনে বিজেপি সারা দেশে ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। যদি মোট ভোটের ২০ শতাংশ মুসলিম ভোট হয় তাহলেও আরও ৫০ শতাংশ হিন্দু ভোটতো বিজেপি পায়নি। সহযোগী দলগুলির ভোটকে যুক্ত করেও বলা যায় অন্ততঃ ৪৫ শতাংশ হিন্দুভোট বিজেপি-র নাগালের বাইরে। বিজেপি যা হিন্দু ভোট পেয়েছে, অন্য দলগুলি সবাই মিলে তার থেকে বেশি হিন্দু ভোট পেয়েছে, যদিও তারা আসন কম পেয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকেই এই কথা সেক্যুলারপন্থীরা ও বিজেপি-র মধ্যে বাজপেয়ী অনুগামীরা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং তাঁরা বোঝাতে সফলও হয়েছেন। যুক্তিটা ছিল এইরকম—সাধারণ হিন্দুরা বড়াই উদার, তারা কট্টরতা বা গোঁড়া হিন্দুত্বকে পছন্দ করে না। মাত্র অল্প কিছু হিন্দু কট্টর হিন্দুত্বকে সমর্থন করে। এদেরকে হিন্দুত্ব গোষ্ঠী বা সমর্থক বলা হয়। এই হিন্দুত্বকে ধরে রাখলে দলের ভোট একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আটকে থাকবে, বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে সঙ্গে পাবে না। আমি আর.এস.এস.-এর বড় বড় কর্মকর্তাকেও এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখেছি। বিশেষ করে ১৯৯৬-এর ১৩ দিনের বাজপেয়ী সরকারের পতনের পর ও ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বহুদলের রামধনু কোয়ালিশনের সাফল্যের পর ঐ যুক্তি, ঐ বিশ্লেষণ বিজেপি ও সঙ্ঘপরিবারের মধ্যে আরও শক্তিশালী হয়েছিল। সুষমা স্বরাজ এবং আরও অনেক নামীদামী নেতাকে ও সঙ্ঘ-অধিকারীকে আমি এর পক্ষে সওয়াল করতে দেখেছি ও শুনেছি। তারই পরিণামে তৈরি হয়েছিল একটি শব্দ---'সর্ব-সমাবেশক'। বিজেপি-কে একটি সর্বসমাবেশক মঞ্চে পরিবর্তিত করতে হবে, ঠিক কংগ্রেসের মত। তবে সেখানে কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রটা থাকবে না। অর্থৎ পরিবারতন্ত্রটা বাদ দিয়ে বিজেপি-র কংগ্রেসীকরণ চাই। এটাই বিজেপি-কে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে, ভোট বাড়বে। কংগ্রেসের মত বিজেপি ও সরকারী ক্ষমতা দুটি স্বাভাবিক মিত্রে পরিণত হবে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাজপেয়ীর বিশাল ব্যক্তিত্ব, রামধনু কোয়ালিশনকে সঙ্গে নিয়ে হাঁসের মত অবলীলায় রাজনীতির কঠিন সমুদ্রে সাঁতার দেওয়ার দক্ষতা, ঝাঁ চকচকে মহাসড়কের স্বর্ণিম চতুর্ভুজ, গ্রামীণ সড়ক বিপ্লব, দ্রব্যমূল্য স্থিতি, মোবাইল ফোন বিপ্লব, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক বাহ্ বাহ্—এ সবকিছুই যেন সাফল্যের এক বিরাট মাত্রা এনে দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি-র ঐ উদারীকরণ বা কংগ্রেসীকরণের সচেতন প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা দল ও সংগঠনের মধ্যে কারও ছিল না।

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাজপেয়ী আদবানীরা এবং তাঁদের দপ্তর যে কোন মানুষের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করতেন। সব সরকারই সেটা করে। এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সঙ্ঘপরিবারের যে কোন সংগঠনের কোন কর্মকর্তা কোন আদর্শগত বিষয়ে বা সরকারের কোন কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে অথবা সরকারকে কোন প্রস্তাব-পরামর্শ দিয়ে চিঠি দিলে বাজপেয়ী আদবানীরা তার উত্তর দিতেন না, এমনকি প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করতেন না এবং তাঁরা তাঁদের দপ্তরকেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন উত্তর দিতে। তাঁদের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা সংগঠনের সমস্ত সদস্য ও কর্মকর্তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

তাই ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বিজেপি-র রথ সর্বসমাবেশক হওয়ার লক্ষ্যে ও কংগ্রেসীকরণের পথে হৈ হৈ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার পর যখন ২০০৪ সালের নির্বাচনে দল মুখ থুবড়ে পড়ল, সবাই যেন দিশাহারা হয়ে গেলেন। এ কী হল? এ তো কল্পনার বাইরে! অবিশ্বাস্য! আমি আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে দেখেছি সেই অবিশ্বাস্যতার ছবি। আর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল ই.ভি.এম. কারচুপির ষড়যন্ত্রের থিওরিতে। এবার নির্বাচনের ফল বেরোনোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ ষড়যন্ত্র থিওরিতে বিশ্বাসী লোকদের আমি দেখেছি। ঐ থিওরিটা ঠিক হলে নিশ্চয়ই এবার এই ফল হত না। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি, হিন্দুত্ব ভোটের সীমাবদ্ধতা ও বিজেপি-র নীতি ও আদর্শের উদারীকরণের প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বটি এতখানি জোরালো হয়েছিল যে ২০০৪-এর নির্বাচনের চরম বিপর্যয়ও ঐ তত্ত্বের উপর কোন প্রশ্নচিহ্ন লাগাতে পারলো না। আমরা কিছু সেই সময়কার কর্মকর্তা, উদারীকরণের নামে মূল আদর্শ থেকে সরে আসার পরিণামেই যে এই ব্যর্থতা, একথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের আওয়াজ বিশ্বজোড়া বাজপেয়ীর জয়ধ্বনির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই বাজপেয়ী সম্পূর্ণ অথর্ব ও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন (যা অনেকেই জানতো না)। তাই বিজেপি-র নেতৃত্ব এলো লালকৃষ্ণ আদবানীর হাতে। স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার একান্তই অভাবসম্পন্ন, অথচ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর এই নেতাটি ঐ বাজপেয়ীর তত্ত্বই অনুসরণ করলেন। বরং তিনি আরও বেশি এগিয়ে গেলেন ঐ পথে। পৃথিবী অবাক হয়ে দেখলো, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা এই নেতাটি পাকিস্তানে গিয়ে জিন্নার প্রশংসা করলেন। সর্বসমাবেশক ও পার্টি আদর্শ উদারীকরণের থিওরির পালের গোদা কংগ্রেসী এজেন্ট বামপন্থী সুধীন্দ্র কুলকার্নীকে নিয়েই চলতে থাকলেন সঙ্ঘের নির্দেশ অমান্য করেও। ২০০৪-এর নির্বাচনে ভরাডুবি থেকে কোন শিক্ষাই নিতে পারলেন না এই অনুকরণসর্বস্ব নেতাটি। পরিণাম—২০০৯-এর নির্বাচনে শুধু মুখ থুবড়ে পড়া নয়, একেবারে হাড়গোড় ভেঙে পড়ে যাওয়া। ২০০৪-এ ১৪০ থেকে ২০০৯-এ ১১৬তে নেমে আসা। তারপর বিজেপি দলটা আর টিকবে বলেই মনে হচ্ছিল না। পরপর দু'টি এতবড় বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে এ পার্টি আর উঠে দাঁড়াতে পারবে বলে মনেই

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ

মোদীর এই বিপুল জয়ের পিছনে আসল কারণটা চেপে যাওয়ার কুচেষ্টা করা হচ্ছে

হচ্ছিল না। কিন্তু সেই গান্ধী-নেহেরুর সময় থেকে সেক্যুলারিজমের হুঙ্কাহুয়ার আওয়াজে বিজেপি-র পরাজয়ের মূল কারণ যে আদর্শকে পরিত্যাগ করা, এ সত্যটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল। পার্টির সেই চরম দুর্দিনে আর.এস.এস.-এর মোহনরাও ভাগবত তাঁর একজন বিশ্বস্ত দক্ষ ম্যানেজারকে (নিতীন গড়কড়ী) দিয়ে পার্টির ভাঙা নৌকার পাটাতনগুলিকে কোনরকমে জোড়া লাগিয়ে তাকে আবার সচল করে দিলেন। সেই সময় দ্বিতীয় ইউ.পি.এ. সরকারের চূড়ান্ত দুর্নীতি ও সোনিয়াদাস মনমোহন সিংহের চূড়ান্ত ক্লীবত্ব বিজেপি-র সামনে নতুন সুযোগ উপস্থিত করল। সেই সময় এগিয়ে এলেন একজন ব্যক্তি, যাঁর মাথায় কেউ মুকুট পড়িয়ে দেয়নি, কেউ যাঁকে অভিষেক করেনি, ডাঃ হেডগাওয়ারের 'স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা' মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত। নাম তাঁর নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, প্রচারক হলেও তাঁর উপযুক্ত পরিচয়---A Selfmade Man। স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, প্রচারক আরও অনেক আছে, কিন্তু মোদী একজনই।

মোদীর বহু গুণ আছে, তার চর্চাও এখন চারিদিকে খুব হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক 'যো জীতা ওহি সিকন্দর'। মোদী পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, দৃঢ় সঙ্কল্প, ম্যানেজমেন্ট দক্ষ, দক্ষ প্রশাসক, বিকাশপুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মোদীর যে গুণ যে দক্ষতাটি এবারের এই সাফল্যের কেন্দ্রে অবস্থিত সেটাকে কেউ তুলে ধরছেন না। হয় বুঝতে পারছেন না, না হয় ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে যাচ্ছেন। সেই দক্ষতা বা গুণ হল সত্য-দর্শনের ক্ষমতা। এই সত্য দর্শনের জন্য মানুষকে হতে হয় স্বাধীনচেতা এবং মনকে হতে হয় সংস্কার মুক্ত। চমকে উঠবেন না, মন ও বুদ্ধি সংস্কারমুক্ত হলে সত্যদর্শন করা যায় না। আচরণ ও অভ্যাস হতে হয় সংস্কারযুক্ত, মন ও বুদ্ধিকে করতে হয় সংস্কার মুক্ত। মোদীর হাজার গুণ নিয়েও ২০১৪-এর ঐতিহাসিক সাফল্য পেতেন না যদি তিনি সত্যদর্শন না করতে পারতেন। ২০০৪ পর্যন্ত বিজেপি ও তার সরকারের সেইসব চোখ ধাঁধানো সাফল্য, উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ সেইসব বহু নেতার উজ্জ্বল উপস্থিতি, বিশ্বজোড়া বাহবাহ, এসবের পরেও ২০০৪ ও ২০০৯ এর এই মুখ থুবড়ে পড়া কেন? মোদীর সত্যদর্শন—আদর্শকে পরিত্যাগ করা, হিন্দুত্বকে পরিত্যাগ করা, হিন্দুত্বের শক্তিতে অনাস্থা। এই সত্যকে দর্শন করেই মোদী দলকে আদর্শের পথে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। হিন্দুত্বে আস্থা রাখলেন। বিশাল হিন্দু সমাজের মধ্যে হিন্দুত্ব একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ—এই তত্ত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। 'যোগ কর্ম সুকৌশলম্'—শ্রীকৃষ্ণের এই নীতি অনুসারে হিন্দু হিন্দু চিৎকার না করেও বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে (যাকে ডঃ সুব্রহ্মনীয়ম স্বামী বলেন 'বিরাট হিন্দু') স্পষ্ট বার্তা দিলেন আচরণের মাধ্যমে। মোল্লা টুপি না পড়া, গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে একজনও মুসলিম প্রার্থী না দেওয়া, উত্তরপ্রদেশের মত ৮০ আসন যুক্ত বিরাট রাজ্যে একজনও মুসলিম প্রার্থী না দেওয়া, ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে বার্তা গেল 'বিরাট হিন্দুর' কাছে। আর সেই বার্তাকে আরও বেশি সংহত করে 'Applied Moditva' তৈরি করলেন অমিত শাহ। স্মরণ করুন উত্তরপ্রদেশে তাঁর সেই আহ্বান, 'ইয়ে বদলে কা চুনাও হ্যায়'। পরিণাম উত্তরপ্রদেশে ৮০-তে ৭৩। কেউ কখনও ভাবতে পেরেছেন, কল্পনা করতে পেরেছেন? এর নাম Applied Moditva—অমিত শাহ'র অবদান।

তাই এই নির্বাচনে এই অভাবনীয় ফলের তাৎপর্য আমার কাছে শুধুই রাজনৈতিক নয়। কংগ্রেস গোহারান হেরে গেল, বিজেপি ও সহযোগী দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল, শুধু এই রাজনৈতিক জয়-পরাজয় নয়। এই ফলের তাৎপর্য আদর্শগত। আদর্শের জয় হল। হিন্দুত্বের জয় হল। হিন্দুত্বের গণ্ডিটা মোটেই সংকীর্ণ নয়—একথা প্রমাণিত হল। নির্বাচনী জয়ের জন্য মুসলিম তুষ্টিকরণের অসারতা প্রমাণ হল। সংখ্যালঘু হয়ে সংখ্যাগুরুর উপর দাদাগিরি করার দিন শেষ---এটা প্রমাণ হল। এগুলির তাৎপর্য রাজনৈতিক জয় পরাজয়ের থেকে অনেক বড়, অনেক গভীর। (ক্রমশঃ)

দুষ্কৃতিদের অশ্লীল আচরণের প্রতিবাদ করে পুলিশি অত্যাচারের শিকার হল নিরীহ গ্রামবাসীরা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত কাঁটাখালি ও ভাণ্ডারিয়া গ্রামের বাসিন্দারা গ্রামের সরকারপাড়া সংলগ্ন মাঠে বৃহস্পতিবার (২২শে মে) রাত ৮টার সময় বসে আড্ডা দিচ্ছিল। সুভাষ সরকার, নিমাই সরকার, বরুণ মণ্ডল, মিহির নস্কররা যখন নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল তখন চক্‌পরাণ কাঁটাখালি সেখপাড়ার কিছু যুবক টর্চ লাইট মারতে মারতে রাস্তার উপর উঠে আসে। মাঠের অপর প্রান্তে প্রশান্ত সরকারের বাড়ির পাশে কয়েকজন মহিলা নিত্যদিনের মতো বসেছিলেন। সেখপাড়ার যুবকেরা মহিলাদের লক্ষ্য করে বারবার টর্চ মারতে থাকে। মেয়েরা চিৎকার করে এর প্রতিবাদ করলে ছেলেগুলো অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে। এদের মধ্যে একজন বলে, 'চলতো মাগীগুলোকে তুলে আনি।' তখন সুভাষ সরকাররা এর প্রতিবাদ করলে উভয়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় সেখপাড়ার সামিন সেখ, ইলিয়াস সেখ, গিয়াস সেখ, মারুক সেখ, মকবুল সেখ, সাজাহান সেখ এই দলটিতে ছিল। বচসার মধ্যেই একজন সেখপাড়ায় ফোন করে জানায় যে তারা হিন্দুদের হাতে আক্রান্ত। মুহূর্তে সেখপাড়া থেকে প্রাক্তন গ্রাম সদস্য মফিজুল সেখ সহ ২৫০-৩০০ জন মুসলিম ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। এমতাবস্থায় চিৎকার চেঁচামেচিতে গ্রামের মানুষও জমায়েত হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে মুসলিমরা পিছু হটতে থাকে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাজির হয় ও কি হয়েছে তা জানতে চায়। পুলিশের সঙ্গে কথা চলাকালীন একটি টাটা সুমো করে পুলিশ, সিভিক পুলিশ, তৃণমূলের ক্যাডারসহ তৃণমূল কংগ্রেসের সমিতির সদস্য তপন কয়াল উপস্থিত হয়। ঘটনার বিবরণ না শুনেই তিনি পুলিশকে লাঠি চার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে বলেন। তখন আশ্চর্যভাবে পুলিশ মুসলিমদের কিছু না বলে হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি একটি রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। তাদের লাঠির আঘাতে চরণ সরকার গুরুতর আহত হয়। তাঁর মাথায় তিনটি সেলাই দিতে হয়। অন্ধ ও খোঁড়া দুঃখীরামও পুলিশের মারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। পবন সরকার, মামণি সরকার, অঞ্জলি সরকার, গোপাল সরকার, সুভাষ সরকার ও সমীর নস্কর পুলিশের লাঠির ঘায়ে কমবেশি আহত হয়।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানায়, প্রায়ই গ্রামের মহিলা ও ছাত্রীদের মুসলিম যুবকদের হাতে আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। পুলিশে অভিযোগ করেও কোন লাভ হয় না। নিজেরা প্রতিবাদের পথ বেছে নিলে পুলিশি অত্যাচারের শিকার হন। এইরকম পরিস্থিতিতে কাঁটাখালি ও ভাণ্ডারিয়া গ্রামের বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। গত দু'দশকে মগরাহাটে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। মূলতঃ সেলিমের দাপটে এই অঞ্চলের হিন্দুরা আতঙ্কে দিন কাটায়।

১ম পাতার শেষাংশ

পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত সভা-ফেরত হিন্দু সংহতির কর্মীরা

আংড়াইলের গ্রামে বক্তব্যরত সংহতির সহ-সভাপতি শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, উপবিষ্ট সংহতি সভাপতি ও অন্যান্যরা

অসহায় গ্রামবাসীরা তাদের সামনে পুলিশ-প্রশাসন-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশী হানাদারদের অবৈধ আঁতাতের এক করুণ চিত্র মেলে ধরেন।

এলাকার হিন্দু রমণীদের উপর ওপার বাংলার দুর্বৃত্তদের কুনজরের কথা সহ এপার-ওপার দুই বাংলার মিলিজুলি অপরাধীদের বিরুদ্ধে অনেককেই প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে দেখা যায়। এরপর শ্রী ঘোষ স্থানীয় আংড়াইল বাজারে একটি পথসভায় এলাকার যুবকদের সংগঠিত এক শক্ত প্রতিরোধের ডাক দিলে, স্থানীয় যুবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। বেআইন যেখানে আইন, সেই স্থানের সমাবেশ থেকে তিনি সমবেত স্থানীয় অত্যাচারিত নাগরিকবৃন্দকে প্রশাসন অথবা কোন রাজনৈতিক দলের উপর ভরসা না করে সংঘর্ষের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান এবং যে কোন পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য যে উক্ত পথসভায় স্থানীয় মহিলাদের বহু সংখ্যক নির্ভীক উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এইদিনের পথসভা উপলক্ষে দূরদূরান্ত থেকে আগত অন্তত হাজার দুয়েক সংহতিকর্মীর উপস্থিতিও এলাকার মানুষকে প্রভাবিত করে।

এই জমায়েতের ফলে এলাকার সমাজ-বিরোধীরা প্রমাদ গণে, তাই স্থানীয় দুষ্কৃতিদের সাহায্য নিয়ে ওই দিনের সভায় উপস্থিত নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর আঘাত হানার এত তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা তারা ছকে ফেলল—যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে সমস্তরকম প্রতিরোধের পথ অবরুদ্ধ করে দেওয়া যায়।

খবরে প্রকাশ, আঙ্গারপুকুরিয়া গ্রাম থেকে বহু মানুষ সেইদিনের সমাবেশে যোগ দিতে আংড়াইল এসেছিলেন। এই পথেই পাইকপাড়া নামে মুসলমান অধ্যুষিত একটি গ্রাম পড়ে। দুষ্কৃতকারীরা সভা-ফেরত নিরীহ গ্রামবাসী তথা সংহতি কর্মীদের উপর আক্রমণ শানানোর নিরাপদ স্থান হিসাবে এই স্থানটিকেই বেছে নেয়। পূর্ব পরিকল্পনামাফিক ২০০-২৫০ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতি মারাত্মক ও প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই পথে রাতের আঁধারে শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ঘরমুখো গ্রামবাসীরা সেই স্থানে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উন্মত্ত দুষ্কৃতির দল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তে এলাকাটি রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। একটি টাটা-২০৭ মিনি ট্রাক এবং একটি ম্যাজিক ভ্যান সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বহু সংহতি কর্মী এমনকি মহিলারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পান নি। তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ থেকে শুরু করে নির্মমভাবে প্রহার—কোনটিই বাদ যায় নি। ঘটনায় বহু সংহতি কর্মী আহত হন। দুই গাড়ির চালক অনুপ বারুই এবং বিজয় বারুই গাড়ি ছেড়ে পালাতে না পারার জন্য নৃশংসভাবে প্রহৃত হন। বেশ কিছু সংহতি কর্মীকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে ভর্তি করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্থানীয় জেলা পরিষদের সভাপধিপতি রহিমা বিবির বাড়ি এই পাইকপাড়া গ্রামেই। এই আক্রমণে তাঁর পরোক্ষ মদত আছে বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে পুলিশ কিছু পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু দেখা যায় তারা আক্রমণকারী পাচারকারীদের হয়েই নির্লজ্জভাবে সওয়াল করতে শুরু করেন এবং আক্রান্ত গ্রামবাসীদের হুমকি দিতে থাকেন। তারা আরও বিস্মিত হন এই দেখে যে তাদেরই আক্রান্ত তিন সহকর্মী যথাক্রমে স্বপন গোলদার, বিকাশ বিশ্বাস এবং সুশান্ত বিশ্বাসকে পুলিশ অকারণে গ্রেফতার করে, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাতকারণে একজন আক্রমণকারীকেও গ্রেফাতর করে না।

হিন্দু সংহতির বনগাঁর বলিষ্ঠ নেতা শ্রী অজিত অধিকারীর নেতৃত্বে আহতদের দেখাশোনা সহ অভিযুক্তদের আইনি সহায়তা দেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে। পরিস্থিতির উপর সর্বক্ষণ কড়া নজরও রাখা হচ্ছে যাতে যে কোন প্রতিকূলতার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। এলাকার হিন্দু বাসিন্দাদের মনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে এক চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, কলকাতার আড্ডায় বসে যার আঁচ পাওয়া সম্ভব নয়।

বসিরহাটের ভোটাররা ভাবছে ভোট দিতে না গেলেই ভালো হত

দেশে লোকসভা নির্বাচন শেষ। অপ্রতিরোধ মোদী হাওয়া বইছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শুধু নিজ দল বিজেপি-র ক্ষমতায়। তাঁরা দেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ''দেশে সুদিন আসছে''। কিন্তু বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বহু গ্রামের বিজেপি ভোটারদের কাছে সুদিন তো দূরের কথা, দুর্দিনের আতঙ্ক তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অপরাধে তারা এরাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও তার পোষা মুসলিম গুণ্ডাদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে বারবার। বিশেষ করে সন্দেশখালি ও হাড়োওয়া থানার গ্রামগুলির হিন্দু ভোটাররা আজ বিপন্ন। রক্তহিম করা এই তৃণমূলী আক্রমণ ও হুমকির সামনে পড়ে কেউ আহত, কেউ নিহত, কেউ গ্রামছাড়া। মিডিয়াতে বেশী প্রচার হওয়ায় সন্দেশখালিতে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতারা এসেছিলেন। কিন্তু বেশীরভাগ জায়গাতেই আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। ইতিপূর্বে বিজেপির নেতারাও আক্রান্ত হয়েছেন।

এই চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে ত্রাহি ত্রাহি রব করা বিজেপি সমর্থকরা ভাবছেন—ভোট দিতে না গেলেই ভালো হত। ভোট দিয়ে বিজেপি প্রার্থীকেও জেতানো গেল না, অথচ ভোটদাতারা হলেন আক্রমণের ও অত্যাচারের শিকার। তাদের এই অসহায়তা ও দিল্লির চিত্র পরস্পর বিপরীত। বিশেষতঃ সন্দেশখালী থানার গোলবুনিয়া, পুকুরপাড়া, সরবেড়িয়া তালতলা প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু ভোটদাতাদের অবস্থা খুবই করুণ। আক্রমণ, বোমাবাজি ও হুমকির শিকার তারা। তাদের বাঁচানোর কেউ নেই। তাই তারা আজ ভাবছে, ভোট দিতে না গেলেই ভালো হত।

মাননীয় কবীর সুমন মহাশয়ের নিকট খোলা চিঠি

মাননীয়
কবীর সুমন মহাশয় সমীপেষু,

আপনি 'জয় শ্রীরাম' চলচ্চিত্র নিয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন দেখলাম। বয়ানটি কপি করে দিলাম...

বন্ধু কমরেড শত্রুরা,

জরুরি খবর। শ্রী জুল মুখার্জি নামে এক স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা ''জয় শ্রীরাম'' নামে একটি ছবি বানিয়েছেন। সেই খবর প্রচারিত হওয়ায় হিন্দুত্ববাদীরা তাঁকে সমানে গালিগালাজ করে এবং তাঁকে খুনের হুমকি দিয়ে ফেসবুকে লিখছেন। শ্রী মুখার্জি আমায় জানালেন ''জয় শ্রীরাম'' ছবিটির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, হিন্দুত্ববাদীরা তাঁদেরও নাম-ঠিকানা খুঁজে বের করছেন এবং তাঁদেরও খুনের হুমকি দিচ্ছেন। শ্রী জুল মুখার্জির সঙ্গে যাঁরা সংহতিতে থাকবেন তাঁরাও এইভাবে আক্রান্ত হবেন। অনেক হানাদারই বলছেন—১৬ তারিখের পর দেখে নেব। ১৬ মে, অর্থাৎ আসছে কাল—ভোটের ফল বেরোনোর দিন। জুলবাবু আমায় এও জানালেন যে ইউনাইটেড কিংডম থেকেও এক ব্যক্তি তাঁকে লিখেছেন, ''মনে রাখবেন, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র''—মুসলিম বিরোধী ইউটিউবে আমার কিছু সং-ভিডিয়োর নিচে তাঁদের রুচিমাফিক মন্তব্য করেছিলেন। ২০০২ সালে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে একটি অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমায় শুনতে হয়েছিল দর্শকদের কাছ থেকে— ''এর পর লুঙ্গি পরে আসবি।'' —কবীর সুমন নামটি নেওয়ার পর থেকে এ ধরণের অনেক মধুর উক্তিই শুনেছি। তাতে আমার তেমন যায় আসে না। আমি চিন্তিত শ্রী জুল মুখার্জি ও তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে এবং তিনি যে এইভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন—সেই ব্যাপারটি নিয়ে যেদিন জাতীয় পুরস্কার নিতে দিল্লি গেলাম, সেদিন সকালে সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য আমায় টেক্সট করে জানান, জনৈক তৃণমূল বিধায়ক, শ্রী মাহাতো, সি পি আই এম-এর শ্রীযুক্ত মহম্মদ সেলিমকে তাঁর ধর্ম তুলে গাল দিয়েছেন। সুমন আমায় বলেছিলেন—এর প্রতিবাদে আমি যেন একটা গান লিখি। এমন ঘটনার প্রতিবাদে গান বাঁধতে ইচ্ছে করে না, অন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে। সার্বিকভাবে হিন্দুত্ববাদ ও মুসলিমবিদ্বেষ বেড়ে চলেছে এবং যা মনে হচ্ছে চলবে। ভারত সেকিউলার রাষ্ট্র। আমার একান্ত আশা, ভোটের ফল যাইই হোক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা এই ভারতবিদ্বেষী অপশক্তিগুলোর বিরুদ্ধে একজোট হবেন, একজোট থাকবেন এবং প্রতিরোধ করবেন। এই অপশক্তিগুলোই দেশের শত্রু। ধর্মের নামে রাজনীতি যারা করে—তা সে যে-ধর্মই হোক—তারা দেশের পয়লা-নম্বর শত্রু।

আপনাকে সমাজের একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসাবেই জানে দুই বাংলার মানুষ। তাই শ্রদ্ধাপূর্বক কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে—

১। আপনি তো কমিউনিস্ট, তাহলে আপনার নাম পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়লো কেন?

২। আপনি 'নাম পরিবর্তন' বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন করার কথা বললেন না কেন?

৩। একজন কমিউনিস্ট বা বামপন্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তি, যিনি ধর্ম মানেন না, তিনি কি ধর্ম পরিবর্তন করতে পারেন?

৪। একটি হিন্দু-বিরোধী চলচ্চিত্রের নির্মাতাকে হিন্দুত্ববাদীরা গালাগালি করছেন, তাতে আপনার এত কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে এত হিন্দু, বৌদ্ধ যে দিনের পর দিন লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে, এই সব সম্প্রদায়ের নারীরা ধর্ষিত হচ্ছেন, মন্দির মঠ ভাঙছে, আপনার ফেসবুকে বা কলামে কিন্তু এসবের কোনও প্রতিবাদ দেখি না। এই যে সেদিন কলকাতা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে নলিয়াখালিতে এত হিন্দু বাড়ি পুড়িয়ে দিল মুসলিমরা তখন তো আপনি প্রতিবাদ করেন নি। দেগঙ্গার সময় করেছিলেন?

৫। কামদুনি ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনি একটি গান লিখেছিলেন মনে আছে? ওখানকার আন্দোলনকারী গৃহবধূরা যখন সরাসরি মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে দোষারোপ করেছিল, মাননীয়া মীরাতুন নাহার সম্ভবত সেই অভিযোগের কথা টিভিতে স্বীকারও করেছিলেন, তখনো আপনি সেই অভিযোগের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে নির্বিচারে পুরুষতন্ত্রকে দায়ী করে গান বাঁধলেন। এটি কি পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত নয়?

৬। আপনি ''নাম'' পরিবর্তনের পর নিয়মিত টিভি সাক্ষাৎকারের শুরুতে বরাবর বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছেন। এটাই আপনার ''সেকিউলারিজম্'' নাকি এটাই সাম্যবাদ আর বামপন্থা?

৭। সার্বিকভাবে ''হিন্দুত্ববাদ এবং মুসলিমবিদ্বেষ বেড়ে চলেছে'' এটা আপনি হয়ত ততখানি মিথ্যা বলছেন না, কিন্তু সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে দেখলেই বোঝা যায় অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুসলিম বিদ্বেষ বেড়ে চলেছে। কিন্তু কেন? ইজরায়েলে ইহুদি, আমেরিকা, ইউরোপে খ্রিস্টান কিম্বা মায়নমারে বৌদ্ধ, কেউ মুসলিমদের ভাল চোখে দেখছে না। দোষ কার, আপনি জানেন না, একথাও কি মেনে নিতে হবে?

৮। জুল মখার্জীকে ইউনাইটেড কিংডম থেকে একজন বলেছেন ''মনে রাখবেন, ভারত হিন্দুরাষ্ট্র''। এতে আপনি বেজায় চটেছেন। কিন্তু এই বাক্যে ভুল কোথায়? দেখুন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি বলেছেন— ''হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তি করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে? আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর—আর কাহারও নয়।'' তবে কি তিনিও মিথ্যা বলেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দও ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলেই মনে করতেন। তারাও কি মিথ্যা ছিলেন?

৯। আপনি সরাসরি বললেন হিন্দুত্ববাদীরা ভারতবিদ্বেষী? কিন্তু কয়েক হাজার বছর এই ভারতবর্ষে হিন্দুরা থেকেছে, তাতে তো ভারতের কোনও ক্ষতি হয় নি বরং সমৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু ''ইসলামের ভারতে আগমন সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তাক্ত অধ্যায়'' লিখেছেন উইল ডুরান্ট। শরৎচন্দ্র লিখেছেন ''একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।'' এই হিন্দুদের উপর আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য হিন্দু ঐক্যের মতবাদই তো হিন্দুত্ববাদ। এতে দোষ কোথায়? সম্প্রতি হিন্দুবিরোধী আকবরুদ্দিন ওয়েসির বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপনার কোন প্রতিক্রিয়া দেখিনি।

১০। ''হিন্দু ধর্ম থেকে একজন অন্য ধর্মে চলে যাওয়ার অর্থ একজন কমে যাওয়াই নয়, একজন শত্রু বৃদ্ধি হওয়া''—বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আপনি কি মনে করেন না, এই সত্যবাক্যের অন্যতম একটি প্রমাণ আপনি? অনেকদিন আগে গোলাম মোস্তফা নামে এক কবির একটি সুখ্যাত বই পড়েছিলাম। বইটির নাম ''ইসলাম ও কমিউনিজম''। তার সিদ্ধান্ত ছিল, কমিউনিজম্‌কে ইসলামের হাতে একদিন পদানত হতেই হবে। আপনি কি মনে করেন না যে, আপনি এই সিদ্ধান্তের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে উত্তর দিলে বাধিত থাকব।

—ইন্দ্রজিৎ

আব্দুল বারিকের জামিন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট

আব্দুল বারিক বিশ্বাস। নামটা খুব চেনা লাগছে না? এই সেই আব্দুল বারিক বিশ্বাস যে প্রায় দুমাস আগে প্রত্যেকটি টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্রের শিরোনামে ছিল। যাকে গত ৯ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার বেলিয়াঘাটা কালিযানি বিলের কাছে একটি অ্যাম্বুলেন্স থেকে আটক করা হয়। ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দারা সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার করে ৪২ কেজি ৪০০ গ্রাম সোনা। বর্তমানে যার বাজার দর প্রায় ১৩ কোটি টাকা। সেদিন তার সাথে ছিল গাড়ির চালক মোকসেদ মণ্ডল। মোকসেদ সহ বারিককে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলাদেশ থেকে ওই সোনা আনা হয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়ার তিনদিন পর অর্থাৎ ১২ই মার্চ তাদেরকে জামিনে ছেড়ে দেয় কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালত। ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দারা সোনা পাচারের ঘটনায় তাকে ধরেও বেশিদিন তাদের হেফাজতে রাখতে পারেনি, কারণ আদালতে পেশ করা নথির মধ্যে বাজেয়াপ্ত সোনার 'সিজার লিস্ট' নেই, তাছাড়া গ্রেফতারির নথি 'মেমো অব অ্যারেস্ট'- এ প্রত্যক্ষদর্শীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ফলে ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল আদালত তিনদিনের মধ্যে জামিনে মুক্তি দেয়। আব্দুল বারিক বিশ্বাসের সঙ্গে রাজ্যের শাসক দলের ঘনিষ্ঠতা এবং সেই সূত্রে প্রভাব প্রতিপত্তি এ ক্ষেত্রে বড় কারণ হয়েছিল বলে শোরগোল পড়ে যায়। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট ওই দুই অভিযুক্তের জামিন খারিজ করল। তাদের ফের হেফাজতে নেওয়ার জন্য ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দাদের আবেদনও অনুমোদন করেছে উচ্চ আদালত। গত ১৪ই মে বুধবার বিচারপতি অসীম কুমার রায় ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সকে (কলকাতা শাখা) নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে ওই দুই অভিযুক্ত আব্দুল বারিক ও মোকসেদ মণ্ডলকে যেন তারা হেফাজতে নেয়। এর ফলে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে আশা করা যায়।

সীমান্তে ধর্ষিতা হিন্দু রমণী ঃ মানুষ অসহায়

এই স্থানেই ধর্ষিতা হন গৃহবধূ।

গত ২১ মে ভর সন্ধ্যাবেলায় ১৭ বছরের সদ্য বিবাহিতাকে জনাকীর্ণ দত্তপাড়া বাজারের কাছে রাস্তার ধারে গণধর্ষণ করা হল। এক্ষেত্রেও সেই একই চিত্র—ধর্ষিতা একজন সাধারণ হিন্দু মহিলা এবং ধর্ষকরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কুখ্যাত দুষ্কৃতি।

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর থানার দত্তপাড়া গ্রাম। আন্তর্জাতিক সীমা থেকে তিন কিমি দূরে অবস্থিত এই গ্রামের একটি পাড়া লতার খাল। পঞ্চায়েতের নাম গোবিন্দপুর। বাজার থেকে ফিরছিল বছর সতেরোর রাখী বিশ্বাস (নাম পরিবর্তিত)। সদ্য বিবাহিত, স্বামী কর্মসূত্রে দুবাই-এ থাকে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আচমকা পাড়ারই দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতি বাহারউদ্দিন এবং সাইফুল তার মুখে গামছা বেঁধে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। অবশেষে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা স্বরূপনগর থানায় ঐ অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের নামে এফ.আর.আই. করে। খবর পেয়ে সংহতি কর্মীরা পরদিন সেখানে যায়। দেখা যায় অপরাধীদের বাড়িতে কোনও পুলিশ নেই, কিন্তু ধর্ষিতার ফাঁকা বাড়ি পাহারা দিচ্ছে জনা ছয়েক সিভিক পুলিশ। ধর্ষণের স্থানে পুলিশ পাহারা নেই। সাক্ষ্যপ্রমাণ যে কেউ নষ্ট করতে পারে, হয়ত ইতিমধ্যে তা নষ্ট করা হয়েও গেছে।

লাভপুরে গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ঘটনার দুমাস পরেও ধর্ষণের স্থান পাহারা দিচ্ছিল পুলিশ—সাক্ষ্য প্রমাণ সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে। অথচ এক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, লাভপুরে তথাকথিত অভিযুক্তরা সবাই হিন্দু ছিল বলেই হয়তো সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেছিল। তাই ধর্ষণের প্রমাণকে অটুট রাখতেই পুলিশের ছিল এত তৎপরতা।

আশ্চর্যের বিষয় তৃণমূল বিধায়ক শ্রীমতি বীনা মন্ডলকে ফোন করলে তিনি জানান এ বিষয়ে কিছুই শোনেননি। অথচ ক্ষিপ্ত জনতা অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে যখন পথ অবরোধ করেছিল তখন তিনিই আবার দলবল নিয়ে এসেছিলেন সেই অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতা এবং সাংবাদিকদের উপর চড়াও হতেও পিছপা হয়নি তাঁর দলবল। ই টিভির সাংবাদিককে তো রীতিমতো মারধোর করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে এসব করে তিনি কার স্বার্থ রক্ষা করছিলেন? ধর্ষিতার না কি ধর্ষকদের?

মেয়েটি যখন হাসপাতালে ভর্তি, তখন জনৈক গ্রামবাসীর মোবাইলে খবর এলো যে পুলিশ সাংবাদিকদেরকে মেয়েটির সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে দিচ্ছে না। তার পরেই খবর এলো যে মেয়েটির মা-কে ঘটনা চেপে রাখার জন্য মোটা অঙ্কের টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাহলে পুলিশের ভূমিকাও কি সন্দেহের ঊর্দ্ধে? আসলে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে—যেক্ষেত্রে হিন্দু অত্যাচারিত, সেক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হল অত্যাচারির শাস্তিবিধান নয়, বরং ঘটনাকে চেপে দেওয়া।

সীমান্তে বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের চলে অবাধ বিচরণ। পুলিশের গাড়ি সেখানে যেতে পারে না। বি.এস.এফ. দাঁড়িয়ে থেকে গরু পাচারে সাহায্য করে। এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুরা স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতি এবং এই বাংলাদেশী পাচারকারীদের যোগসাজসে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। হিন্দু যুবতী মেয়ে-বউদের উত্যক্ত করা, শ্লীলতাহানি করা এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। এমনকি হিন্দু স্কুলছাত্রীরাও এদের হাত থেকে রক্ষা পায় না। সম্মানহানির ভয়ে সবাই নীরবে সহ্য করে অথবা এই অত্যাচারে ধীরে ধীরে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারা। গত ছয়মাস আগে এই দত্তপাড়ার বাসিন্দা মাধব সরকার এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় এই একই কারণে। তার স্ত্রীর দিকে কুনজর পড়েছিল ধর্ষণকারী বাহারুদ্দিনের। মান ইজ্জত বাঁচাতেই গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত মাধবের। এরকম বহু ঘটনা অহরহ ঘটছে। হিন্দুদের বাঁচানোর কেউ নেই।

গত ২৪ মে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ ওই দত্তপাড়া গ্রামে ধর্ষিতার বাড়ি যান। তিনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে ধর্ষিতাকে তার শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিতে আপত্তি উঠেছে। সংহতি সভাপতি ওই মহিলার পুনর্বাসনের জন্য সবরকম সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাছাড়া তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন।

বীরভূমের গ্রামে গ্রামে চলছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নির্বিকার প্রশাসন

বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার বুধিগ্রাম অঞ্চলের ধল্লা গ্রাম। বর্ধিষ্ণু, সম্পন্ন হিন্দুদের গ্রাম। এই গ্রামের সম্পন্ন চাষী সমর সাহা। তিনি আবার ফরওয়ার্ড ব্লক দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক বা এল.সি.এস। হয়তো সেই সুবাদেই তার স্ত্রী পূর্ণিমা সাহা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী। বামফ্রন্ট আমলে পাওয়া চাকরি। সমর সাহার বড় ছেলে প্রসেনজিত সাহা গত ১৮ মে তারিখে বেলা ১১টা নাগাদ বুধিগ্রাম থেকে ধান কেটে ফিরছিলেন। মাঝ রাস্তায় পার্শ্ববর্তী ইমামনগর গ্রামের কয়েকটি মদ্যপ মুসলিম ছেলে তার সঙ্গে অকারণে ঝগড়া শুরু করে। বচসায় জড়িয়ে পড়ে সামান্য ধাক্কাধাক্কি হয়। প্রসেনজিতের ফোন পেয়ে তার বাবা সমর সাহা তাড়াতাড়ি সাইকেলে চেপে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি ঐ ছেলেদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা কোন কথা না শুনে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে। এই ছেলেগুলিকে সমর বাবু বা তাঁর ছেলে প্রসেনজিত চেনে না। তাই তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিত এবং পঞ্চায়েতের সচিব কালাম শেখকে ফোন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ হয় না এবং তারা অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

তারপর যে ঘটনা ঘটল তা তাদের কল্পনার বাইরে। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য (কংগ্রেস) শেখ আলম এবং সমর বাবুর বন্ধু কালাম শেখের নেতৃত্বে প্রায় ৫০ জন মুসলমান ইমামনগর থেকে এসে সমরবাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়ে ও প্রসেনজিতের খোঁজ করে। সমরবাবু প্রসেনজিতকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে শিকল দিয়ে দেন। তাতে ঐ মুসলিমরা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে সমরবাবুকে আক্রমণ করে। লোহার রড দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা সাহা বাধা দিতে গেলে তাঁকেও আঘাত করা হয় এবং তাঁর বাঁ হাতে গুরুতর চোট লাগে। তার সঙ্গে চলতে থাকে অকথ্য নোংরা গালাগালি। পূর্ণিমা দেবীর গায়েও হাত দেওয়া হয়। ধল্লা গ্রামের লোকেরা প্রথমে কিছুই জানতে ও বুঝতে পারেনি। হৈ চৈ শুনে তারা সমরবাবুর বাড়িতে একে একে আসতে থাকে এবং ঐ মুসলিম দুষ্কৃতিদের বাধা দেয়। তখন ঐ দুষ্কৃতিরা চলে যায়। যাওয়ার সময় তারা আর একজন হিন্দু স্বপন মাল-এর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর করে যায়।

ইতিপূর্বেই ধল্লা গ্রামের কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য কৈলাস মাল সকালের ঘটনাটি জানতে পারেন এবং তিনি খবরও পেয়েছিলেন যে সন্ধ্যায় হামলা হতে পারে। তাই তিনি তার দলের নেতা শেখ আলমকে অনুরোধ করেছিলেন দলবল নিয়ে ধল্লা গ্রামে না ঢুকতে এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে

আহত সমরবাবু ও পূর্ণিমা দেবী

প্রসেনজিতকে তাদের সামনে হাজির করিয়ে একটা মীমাংসা করে দেবেন, অর্থাৎ প্রসেনজিতকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করাবেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সন্ধ্যায় আক্রমণের পর খবর পেয়ে মারগ্রাম থানার পুলিশ এসেছিল। পুলিশ সমরবাবু ও তার স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠায়। সমরবাবুর মাথায় তিনটি সেলাই পড়ে। পূর্ণিমা দেবীর হাতেও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর থানায় গিয়ে হাসপাতালের ইনজুরি রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে এফ.আই.আর. করা হয় আলম শেখ, শেখ কালাম ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোন অপরাধীকে ধরে নি। উল্টে মুসলিমরা সমরবাবু ও তাঁর পরিবারকে চরম হুমকি দিয়ে চলেছে। সমরবাবুর অন্য দুই ছেলে বাইরে পড়াশোনা করে। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সমরবাবু ও তার স্ত্রী খুবই শঙ্কিত।

ধল্লা গ্রামের হিন্দুরা এই হামলাকে গ্রামের উপর হামলা বলেই মনে করছে। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও বলতে ভুলছে না যে সমরবাবু আগে থেকেই মুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন। আরও উল্লেখ্য, ইমামনগরে সমরবাবুর ৭-৮ বিঘা ধানজমি আছে। গ্রামবাসীদের ধারণা, ঐ জমির উপর আলম-কালামদের নজর পড়ছে। ১৮ মে এই ঘটনা ঘটে। ১৯ মে অন্য কাজে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ রামপুরহাট গিয়েছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ২০ মে সকালেই তিনি ধল্লাগ্রামে সমরবাবুর বাড়িতে যান। ঐ পরিবার ও গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁর ধারণা, এখনই সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এই গ্রামের হিন্দুদের বিপদ আসন্ন। ইমামনগরের উপর দিয়েই তাদের যাতায়াত করতে হয়। তাই তারা বেশি চাপের মধ্যে পড়বে। আর রাজনীতির ভরসায় থাকলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হিন্দুদের ধল্লা গ্রাম ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

মুজঃফরনগরের পর এবার মীরাটে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

মুজঃফরনগরের পর এবার মীরাটে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অব্যাহত। উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলার তীরগরান মহল্লায় অবস্থিত বহু পুরানো একটি জৈন মন্দিরের বেশ কিছু জায়গা মুসলিমরা বেআইনিভাবে দখল করে একটি কুয়ো খনন করে। গত ১০মে দুপুর ২টা নাগাদ কুয়োটিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে স্থানটিকে অবৈধভাবে জবরদখল করার চেষ্টা করে। তখন স্থানীয় হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ শুরু হয়। অতর্কিতে মন্দিরের স্থান দখলকে হিন্দুরা বাধা দিলে মুসলিমরা তাদের উপর চড়াও হয়। এরপর ঘটনাটি একটি খণ্ডযুদ্ধের আকার ধারণ করে। তীরগড়ান অঞ্চল থেকে ঘটনাটি শুরু হয়ে বাজাজা বাজার, লালা বাজার, বুধনা গেট অঞ্চলে

ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় প্রায় ৪০ জন আহত, এদের মধ্যে ১২ জন গুরুতর আহত হয়। আহতদের মধ্যে তিনজন গুলিতে গুরুতর জখম হয়। দুই জন চিত্র সাংবাদিকও আহত হন। চলে বেশ কিছু দোকান লুটপাঠ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। প্রায় দুই ঘণ্টা মত এই সংঘর্ষ চলার পর পুলিশ ও র‍্যাফ্ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাংলাদেশ সীমান্তের 'ত্রাস' দুখু শেখ গ্রেফতার

নদিয়ার তেহট্ট এলাকার চারটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বাংলাদেশী ডাকাত দুখু শেখ ওরফে মিনহাজকে গ্রেফতার করল ডোমকলের পুলিশ। সোমবার দুখু গ্রেফতার হওয়ার পর তেহট্ট ও ডোমকলের সীমান্ত এলাকা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুখুর বাড়ি বাংলাদেশে। সেখানে একাধিক খুনের ঘটনা ছাড়াও জলদস্যু ও অপহরণের মামলায় জড়িত ছিল সে ও তার দলবল। বাংলাদেশে পুলিশ-প্রশাসনের চাপে পড়ে এদেশে পাকাপাকি ঘাঁটি গাড়ে দুখু। বিয়ে করে স্থায়ী বাসিন্দা হয় ডোমকলের কামুড়দেয়াড় এলাকায়। তার সাঙ্গোপাঙ্গোরাও এদেশে বিয়ে করে স্থায়ী ডেরা বাঁধে। এক সময় নদিয়ার ফাজিলনগর এলাকা ও মুর্শিদাবাদের নওদা এলাকায় মাওবাদীদের উৎপাত বেড়েছিল। সেই সময় দুখু বলে একজনের নাম শোনা যেত। সেই দুখু এই দুখু কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এই দুখু নদিয়ার থানারপাড়া থানা এলাকায় মূলত ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজ করত বলে পুলিশ জানে। জেলার এক পুলিশ কর্তার কথায়, ''এরা কেবল একটা রাজনৈতিক দলের নয়, স্থানীয় ভাবে কখনও শাসক আবার কখনও বিরোধী দলের হয়ে লড়াই করেছে।'' মাস দু'য়েক আগে দুখুর ডানহাত বলে পরিচিত আলামিন ওরফে সুমন শেখ ধরা পড়ার পর থেকে দুখু হোগলবেড়িয়া এবং বেলডাঙা এলাকায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকত। ডোমকলের এসডিপিও অরিজিৎ সিংহ বলেন, ''নির্বাচনের সময় এই দুখুর দলবল ডোমকল এলাকায় নানারকমের গণ্ডগোল পাকানোর পরিকল্পনা করেছিল বলে খবর আসে আমাদের কাছে। সেই সূত্র ধরেই গ্রেফতার হয় দুখুর সঙ্গী আলামিন ওরফে সুমন। তাকে জেরা করে দুখুর খবর পাই।'' দুখুকে গ্রেফতার করার সময় তার কাছ থেকে হেরোইন মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। দুখুর গ্রেফতারে সীমান্ত এলাকায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপ কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করছেন এলাকাবাসী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চড়ক পূড়ার সময় হোগলবেড়িয়া এলাকায় স্থানীয় হিন্দুদের উপর অস্ত্রশস্ত্রসহ আক্রমণের ঘটনায় এই দুখু শেখের গুণ্ডা বাহিনীর যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা আছে বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা।

পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করলো তিন কিশোর

গত ২৪মে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার রমনা গ্রামে পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে হাত-পা বেঁধে মুখে জামা গুঁজে ধর্ষণ করলো তিন দুষ্কৃতি। তিনজনের নাম যথাক্রমে মোতাহার শেখ, বাপন শেখ এবং পাণ্ডে শেখ। এদের মধ্যে দুজন ছাত্র, আর এক অভিযুক্ত রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে। অসুস্থ ১১ বছর বয়সের ওই কিশোরীকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঘটনায় এলাকাবাসীরা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযুক্তদের বাড়ি ঘেরাও করে। তখন তারা দেখে বাড়ির তালা বন্ধ। এদিন পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর ঘটনাস্থলে যান। তিনি বলেন ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টে কিছু অস্পষ্ট বিষয় এসেছে। তারজন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে আবার মেডিকেল টেস্ট করা হবে।

স্থানীয় সূত্র অনুসারে, সকালে ৯টা নাগাদ ওই নাবালিকা গরু নিয়ে একটি তিল খেতের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় বাহাদিডাঙায় ওই তিন অভিযুক্ত তাকে একা পেয়ে মুখ চেপে পাশের একটি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায়। তারপর ওই নাবালিকার হাত-পা বেঁধে মুখে জামা গুঁজে একাধিকবার ধর্ষণ করে তারা। তারপর তাকে ফেলে চলে যায়। বাড়ির লোক নাবালিকার খোঁজ করতে এসে দেখে, সে তিলখেতের মধ্যে নগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

আরও জানা গিয়েছে অভিযুক্তরা ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে তার উপর চড়াও হয়। তারপর তার হাত পা বেঁধে মুখে জামা গুঁজে এই নারকীয় কাণ্ড চালায়। ঘটনার পরএলাকার মানুষ রাগে ফুঁসছে। এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ তিনজন অভিযুক্তই পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. মহম্মদ রেজাউল করিম স্থানীয় হিন্দু যুবকদের হুমকি দিয়েছেন এই কেস নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে। যুবকরা এই কেস নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাদেরকে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পুরে দেওয়া হবে বলে তিনি হুমকি দেন। এখন প্রশ্ন উঠেছে বার বার ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ করেও দুষ্কৃতিরা কত দিন পার পেয়ে যাবে?

তরুণী বধূকে তিন বন্ধুর গণধর্ষণ

দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে রায়গঞ্জের এক তরুণী বধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করলো তিন দুষ্কৃতি।

রায়গঞ্জের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের নরম কলোনীর এক ২৫ বছরের তরুণী বধূকে গত ১৬ই মে বেলা দশটা নাগাদ বাজার করে বাড়ির ফেরার পথে তিন যুবক অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মীর মহম্মদের বাড়িতে বন্দী করে রাখে। বধূটির স্বামী দিল্লিতে কাজে গিয়েছেন। এরপর পাঁচদিন ধরে তিন যুবক পালা করে ওই তরুণী বধূকে ধর্ষণ করে। পরে ওই বধূর বাড়ির লোকেরা মীর মহম্মদের বাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ওই বধূ পুলিশের কাছে অভিযোগে জানান আকালু মহম্মদের ছেলে পচু মহম্মদ (২৫) তার দুই বন্ধু মাবিদ আলি এবং ইউসুফ আলির সহায়তায় তাকে অপহরণ করে। ওইদিন রাতেই পচু ও তার দুই বন্ধু পর পর ধর্ষণ করে। গণধর্ষণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আসামী পচু মহম্মদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বধূটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিপুল উদ্দীপনায় বনদেবীর পূজা করল গ্রামবাসীরা

দঃ ২৪ পরগণার কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স (কে.এল.সি.) থানার গঙ্গাপুর, উষপাড়া অঞ্চলে গত ৩০শে মে ঘটা করে বনদেবীর পূজা করল গ্রামবাসীরা। দুশো বছর ধরে পুরানো এই বনদেবী মায়ের পূজা হয়ে আসছে ওই অঞ্চলে। কিন্তু কিছুদিন ধরে মন্দিরের কিছু দূরে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য ইসলামিক সমাজ উঠে পড়ে লাগে। আশ্চর্যের বিষয় ওই অঞ্চলে কোনো মুসলমান বসতি না থাকা সত্ত্বেও শুধু হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্য এই নির্মাণের প্রচেষ্টা।

কিন্তু সমস্ত বাধা ও পূজা বন্ধের অপচেষ্টা রুখে দিয়ে পূজা অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়।

কে.এল.সি. এলাকায় হিন্দু সচেতনতা যে বাড়ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, <www.hindusamhatibangla.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012